তারা তরুণদের স্পেস দিতে চায় না। আজকের প্রবীণরা ভুল করেই তো অভিজ্ঞ। হ্যাঁ তরুণ প্রজন্মের আছে অদম্য সাহস, সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তির কলাকৌশল। প্রযুক্তির কল্যাণে চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ চালাতে পারবে নতুবা দেশ অনেকটা পিছিয়ে পড়বে। তরুণরা ভুল করবে, তাদের ভুল শুধরিয়ে দেবার জন্য প্রবীণদের অভিজ্ঞতা / পরামর্শ কাজে লাগাতে হবে। দেশের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে দেশে তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা প্রায় ৫৭%, ৬৫ বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৬%। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কিছু দেশের অগ্রগতি নির্ভর করছে সহস্রাব্দের তরুণ প্রজন্মের ওপর। এমন সময় ও সুযোগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেক বছর পর পর পেয়ে থাকে, বাংলাদেশ এখন সে সময় পার করছে। আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এই প্রজন্মের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়া আর তরুণ প্রজন্মের এ সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই 'পপুলেশন ডিভিডেন্ড' বা জনসংখ্যার বোনাস পাবে দেশ, এগিয়ে যাবে জাতি, নতুবা তাদের কাজে লাগাতে না পারলে তারা প্রবীণ হলে দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

যুবকদের জন্য সামাজিক ব্যবসা একটি অব্যাহত লাভের পথ হতে পারে, যেখানে তারা শুধু অর্থ নয়, মানসিক তৃপ্তি, ক্যারিয়ার গঠন এবং সামাজিক সম্মানও অর্জন করতে পারে। সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যুবকরা নতুন দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাদের পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ স্বাস্থ্যসেবায় সামাজিক ব্যবসা শুরু করে, তবে সে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি সেবা বা নীতিনির্ধারণে দক্ষ হতে পারে। সামাজিক ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে যুবকরা তাদের যোগাযোগের পরিধি বাড়াতে পারে, অন্য উদ্যোক্তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং নতুন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। এটি ভবিষ্যতে তাদের কর্মজীবনে সাহায্য করতে পারে। যদিও সামাজিক ব্যবসার উদ্দেশ্য মুনাফা নয়, তবে সঠিকভাবে পরিচালিত হলে সামাজিক ব্যবসাও লাভজনক হতে পারে। সামাজিক ব্যবসার মডেল এমনভাবে তৈরি করা যায়, যাতে তা সমাজের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি লাভজনকও হয়। মুনাফা থেকে নতুন উদ্যোগ শুরু করা, প্রকল্পগুলো সম্প্রসারণ করা এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রাহক চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে ব্যবসাটি বৃদ্ধি পেতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সামাজিক ব্যবসা পরিচালনা করে তখন সে সমাজে সম্মান এবং স্বীকৃতি পেতে পারে। যুবকরা তাদের উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব ফেলতে পারে এবং এতে সামাজিক সম্মান অর্জন করতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে সাহায্য করতে পারে।

যুবকরা সাধারণত নতুন কিছু করার প্রতি আগ্রহী। সামাজিক ব্যবসা তাদের জন্য একটি সুযোগ, যেখানে তারা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে। এটি তাদের জন্য একটি "মিশন" বা লক্ষ্য হিসেবে কাজ করতে পারে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করে। সামাজিক ব্যবসা পরিচালনাকারীরা বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়ন পেতে পারে। অনেক সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও বা সামাজিক ইনভেস্টররা সামাজিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক থাকে, এর মাধ্যমে যুবকরা তাদের উদ্যোগকে আরও বড় আকারে গড়ে তুলতে পারে। সামাজিক ব্যবসাগুলো অনেক সময় পরিবেশবান্ধব এবং নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি বা চিন্তাধারা ব্যবহার করে, যা যুবকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হতে পারে। তারা এমন উদ্যোগের অংশ হতে পারে যা পরিবেশ রক্ষা বা পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করার দিকে কাজ করে, যা তাদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ। সামাজিক ব্যবসায় যুক্ত হয়ে যুবকরা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তারা ব্যবসার বিভিন্ন দিক যেমন ব্যবস্থাপনা, বিপণন, আর্থিক পরিকল্পনা এবং দল পরিচালনা শিখতে পারে, যা ভবিষ্যতে অন্য কোনো বাণিজ্যিক উদ্যোগে কাজে আসবে। অনেক সামাজিক ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করে যেমন পরিবেশগত উদ্যোগ, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবায়। যুবকরা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত হতে পারে এবং এটি তাদের আরও বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে।

সামাজিক ব্যবসা সম্পর্কে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে, বিস্তারিত লিখছি না অনেক বড় হবে। দু'একটি লিখছি যেমন- TOMS Shoes এই ব্র্যান্ড প্রতি জোড়া জুতা বিক্রির বিপরীতে একটি জুতা দান করে সমাজের দরিদ্র জনগণের সাহায্য করে। Husk Power Systems এটি ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে কম খরচে সৌরশক্তি সরবরাহ করছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রস্তাবিত থ্রি-জিরো তত্ত্ব (Three Zeros Theory) বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এই তত্ত্ব তিনটি মৌলিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

১. দারিদ্র্য শূন্যে নামিয়ে আনা-ড. ইউনূস মনে করেন যে, দারিদ্র্য কোনো স্বাভাবিক বা স্থায়ী অবস্থা নয়। এটি একটি মানবসৃষ্ট সমস্যা এবং তাই এটি সমাধানযোগ্য। তার মতে, বিশ্বে এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে। তিনি সামাজিক ব্যবসার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন।

২. বেকারত্ব শূন্যে নামিয়ে আনা-ড. ইউনূস বিশ্বাস করেন, মানুষ জন্মগতভাবে উদ্যোক্তা। তবে, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে শুধুমাত্র চাকরিপ্রার্থী করে তোলে। তার তত্ত্বে বেকারত্ব দূর করার জন্য একটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে, যেখানে মানুষ চাকরি খোঁজার বদলে নিজেরা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন ব্যবসার ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩. কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা-জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় ড. ইউনূস পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি এমন একটি পৃথিবীর কল্পনা করেছেন যেখানে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। তার মতে, কার্বন নিঃসরণ কমাতে টেকসই কৃষি, পরিবহন এবং শিল্প প্রকল্প গড়ে তোলা জরুরি।

তত্ত্ব বাস্তবায়নের উপায়:

ড. ইউনূস থ্রি-জিরো তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি মূলনীতি প্রস্তাব করেছেন:

১. সামাজিক ব্যবসা: ব্যবসা হবে লাভ অর্জনের জন্য নয়, বরং সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য।

২. তরুণ প্রজন্ম ও প্রযুক্তির ব্যবহার: তরুণদের সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. মানবিক মূল্যবোধ: ব্যবসা ও অর্থনীতিকে মানবিক এবং টেকসই সমাজ গঠনের দিকে পরিচালিত করা।

প্রভাব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:

ড. ইউনূসের এই তত্ত্ব বর্তমানে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শুধুমাত্র একটি দার্শনিক ধারণা নয়, বরং বাস্তব জীবনে কার্যকর করার মতো একটি রূপরেখা। এর মাধ্যমে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করা সম্ভব যেখানে দারিদ্র্য থাকবে না, কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন টেকসই হবে। ড. ইউনূসের থ্রি-জিরো তত্ত্ব আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটি পৃথিবীকে একটি অধিক মানবিক এবং সমতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে।

পরিশেষে একটি ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং টেকসই পৃথিবী গড়তে সুষম সম্পদ বণ্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে যেখানে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্ব এবং পরিবেশগত বিপর্যয় একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মতে সামাজিক ব্যবসা ও থ্রি-জিরো তত্ত্ব এই ধরনের সুষম সম্পদ বণ্টন ও সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সময়োপযোগী এবং কার্যকর মডেল হতে পারে।

E-mail: tahazzatali@gmail.com

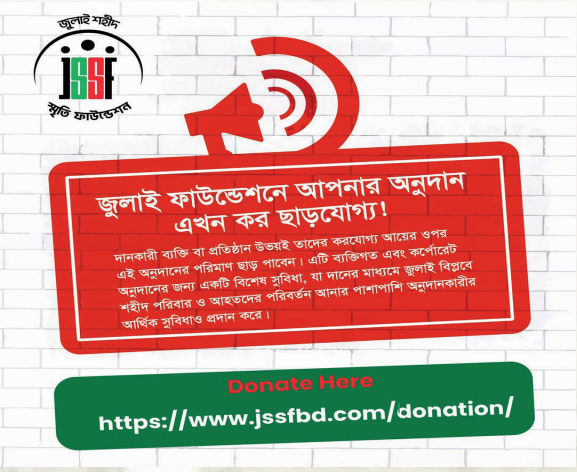

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে রাষ্ট্রপতি শহিদ জিয়াউর রহমান এর অবদান

কৃষিবিদ ড. মো. কফিল উদ্দিন
সিনিয়র বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

স্বাধীনতার মহান ঘোষক সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে শক্ত ভিত রচনা করে গেছেন। জিয়াউর রহমানের আমলে বাস্তবায়ন করা বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। খাল খনন, গণশিক্ষা, গ্রাম সরকার, ভিডিপির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিতে নাগরিকদের সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাম বা গণমানুষকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনীতি ও কৃষিতে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রয়োগের প্রথম ধাপে কৃষিতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। দেশের ইতিহাসে ওই সময়কে সবুজ বিপ্লবের কাল বলে উল্লেখ করা হয়।

খাল খনন কর্মসূচি দিয়ে জিয়াউর রহমানের পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করা যায়। দেশের অন্যতম সফল ও আলোচিত এক গণমুখী সামাজিক কর্মসূচি হচ্ছে খাল খনন কর্মসূচি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। জিয়াউর রহমান প্রাকৃতিক জলাধার সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করেন। সমাজকে সংগঠিত করার এক অনন্য নজির হচ্ছে খাল খনন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টে এই কর্মসূচিকে শুধুই খাল খনন মনে করা যায়।

কিন্তু এই কর্মসূচির বহুমুখী উদ্দেশ্য ছিল, যেমন কৃষিতে সেচ নিশ্চিত করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

সারা দেশে খাল খনন করে প্রাকৃতিক জলাধার নির্মাণের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে উপরিভাগের পানির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক মৌসুমে এসব খালের পানি সেচকাজে ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়া খালগুলোতে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত সারা দেশে দেড় হাজারের বেশি খাল খনন করা হয়। দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ হাজার কিলোমিটার খাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনন ও পুনঃখনন করা হয়। খাল খনন ছিল একধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়েছিল। দল বেঁধে খাল খনন করা তাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

খাল খনন কর্মসূচিতে শহিদ জিয়াউর রহমানের দুর্লভ ছবি

খাল খননের সরাসরি প্রভাব পড়েছিল কৃষিতে। খালের মাধ্যমে কৃষিতে সেচ দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের সেচসুবিধা ছিল কৃষকদের জন্য। ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় বহন করতে হয়নি কৃষকদের। ১৯৭৪ থেকে '৭৫ সালে মোট ৩২ লাখ ২ হাজার ২৫০ একর জমি সেচের আওতায় ছিল। এর মধ্যে ১৫ লাখ ৩৯ হাজার ১৩০ একর জমিতে পাওয়ার পাম্প ও টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হতো। আর ১৬ লাখ ৬৩ হাজার ১২০ একর জমিতে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হতো। খাল থেকে সেচ দেওয়া হতো মাত্র ২ লাখ ৯৩ হাজার ৮৪০ একর জমিতে। ১৯৮১ থেকে ৮২ সালে দেশে মোট সেচের আওতায় আসা জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ লাখ ৬৪ হাজার ৩৩৭ একর। ওই সময় খাল থেকে সেচ দেওয়া জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লাখ ৩ হাজার ৫১৫ একর। শুধু সেচের আওতাই বৃদ্ধি নয়, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্যসহায়তারও পথ খুলে দিয়েছিল খাল খনন কর্মসূচি। কার্যত খাল খনন কর্মসূচি একসঙ্গে অনেকগুলো সাফল্য অর্জনের একটি পরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল। এর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। আগেই বলা হয়েছে কৃষিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এ ছাড়া ওই সময় দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ কার্যত বেকার বসে ছিল। দারিদ্র্যের হার ছিল বেশি। তাদের দ্রুত খাদ্যসহায়তা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরাসরি ভর্তুকি সহায়তা দেওয়ার মতো সংগতি দেশের ছিল না। এ ক্ষেত্রে খাল খনন কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এমনকি একসময় কৃষিজমির আল বা বিভাজনও তুলে দেওয়ার কথা জিয়াউর রহমান বলেছেন। অনেকেই মনে করেন, দেশে কৃষি খাতে যৌথ খামারপদ্ধতি শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। জিয়াউর রহমান সরাসরিই কৃষি সমবায়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে উদার অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার সমন্বয়ের চিন্তাও থাকতে পারে। প্রথম এই কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনীর সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই অংশ নিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যাঁরা খাল খনন করেছেন, তাদের খাদ্যসহায়তা হিসেবে

গম দেওয়া হয়েছিল। এতে করে ওই সময় কিছুটা হলেও খাদ্যসংকটের সমাধান হয়েছিল। তৃণমূল থেকে মতামত তৈরি করে কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রবণতা ছিল। এসবের পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন আগে সেচ ও কৃষিযন্ত্রের খাত পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু জিয়ার আমলে কৃষি খাতে বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। সেচের জন্য গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়ে ওঠে। একজন সেচযন্ত্র কিনে অন্যদের খেতে পানি সরবরাহ করতেন। এ ধরনের গণভিত্তিক উৎপাদপ্রক্রিয়া সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে দেখা যায়। তবে ওই সময়ের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে এসব সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কঠোর সরকারি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বজায় রেখে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে এসব ছেড়ে দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান পুঁজিবাদের চরম মুনাফামুখী আচরণ বা সমাজতন্ত্রের অতি কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে এসে পশ্চিম ইউরোপীয় ঘরানার মডেল অনুসরণ করেছিলেন। নতুন ধারার এ অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণে দেশের শিল্প ও কৃষি খাতে পরিবর্তন জন্য করা যায়। মূলত পশ্চিম ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ঘরানার মডেল অনুসরণের কারণেই জিয়াউর রহমানের কর্মসূচিগুলোতে পরিবেশবান্ধব টেকসই ও গণমুখী কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়।

শহিদ জিয়াউর রহমান কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য কৃষকের হাতে উন্নতি প্রযুক্তি দ্রুত পৌঁছানো এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষিতে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৃষি উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা সংস্কার, কৃষি উপকরণ ব্যবসা উদারীকরণ নীতি প্রণয়ন করেন। বীজের পরে ফসল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো- রাসায়নিক সার, সেচ ও সেচ যন্ত্র আধুনিক চাষ যন্ত্র (পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, রিপার, হার্ভেস্টার) ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন। পূর্বে এ সকল উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ বা সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা-পানি উন্নয়ন বোর্ড, বি,এ,ডি,সি ও বি,কে,বির (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক) মাধ্যমে। এই সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জিয়া ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র, চাষযন্ত্র, এবং সার বিতরণ ব্যাবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি এই সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করে কৃষি উপকরণ ব্যবসা এবং উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থায় সংযুক্ত করেন যেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকচাষিরা এর সুফল পায়। এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সারা দেশে কৃষকদের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ধান উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ সালে ১১.১১ মিলিয়ন টন থেকে ১৯৮০-৮১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.৬৬ মিলিয়ন টন। বর্তমানে কৃষকরা এই সংস্কার কর্মসূচির সুফল ভোগ করছে।

এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্যের আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলার উপর তিনিই প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে তিনি নতুন খাদ্য গুদাম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন যেন অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসল গুদামজাত করে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা যায় এবং প্রয়োজনের সময় খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কৃষদের শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করতে তিনি ভালো দামে তাদের কাছ থেকে সরাসরি ধান চাল ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শহিদ জিয়ার শাসনামলে (৮০-৮১) অর্থবছরে ধান/চাল সংগ্রহ অভিযানে রেকর্ড পরিমাণ (১.০৩ মিলিয়ন টন) চাল সংগ্রহ করা হয় (শাহাব উদ্দিন ও ইসলাম, ১৯৯১)। তাঁর শাসনামলেই ধানের বাম্পার ফলনের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রথম চাল রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠায় শহিদ জিয়ার অনেক অবদান রয়েছে। Presidential Order No. LXII-এর বলে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশে বহুফসল নিয়ে গবেষণা করে এ রকম একটি বৃহৎ স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে সুপরিচিত। এটি বাংলাদেশর বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আবহাওয়া ও পরিবেশ অঞ্চলে খাপ খাওয়ানো উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ বর্তমানে প্রায় ১১২ টি ফসলের উপর বিজ্ঞানীরা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতে করে এদেশের কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলছে।

“কার মুখ”

মো. মুঈন উদ্দিন
সাবেক এমডি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
উপদেষ্টা, শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

অবসর জীবন আট বছরে পড়বে সামনের মাসে। তবু, এখনও ব্যাংকের কুশলাদি জানার বাতিক পিছু ছাড়েনি পিয়ার মোহাম্মদের। তেমন কাউকে পেলেই জানতে চান হালচাল। সুযোগ পেলেই বলেন, “আমাদের সময়ে...” ইত্যাদি। স্ত্রী বিরক্ত হনড় “কবে তুমি ব্যাংকে কি বাঘ মেরেছ, সেসব এদেরকে বলে লাভ আছে? ব্যাংক কি এতদিন বাদে ওখানেই পড়ে আছে নাকি, যতসব!” পিয়ার মোহাম্মদ স্ত্রীর কথায় তেমন আমল দেন না।

হান্নান বিশ্বাসের ছেলের বৌভাতে ব্যাংকের অনেক পুরনো কলিগের সাথে দেখা হলো, স্মৃতির চারণভূমির পুরনো সবুজ ঘাসের কথা ভেবে ঢের তারল্য প্রকাশ হলো, হাসি-তামাশা হলো। একটা চ্যাংড়া অফিসারের দেখা পাওয়া গেল, সে আইটি ডিপার্টমেন্টে আছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বেশ চটপটে। পিয়ার মোহাম্মদ ওর সাথে আলাপ জুড়তে চান। পিয়ার মোহাম্মদ ব্যাংকে অত বড় একখান সাহেব ছিল জেনেও ছেলেটি আলাপে তেমন উৎসাহ পায় না। বরং মোবাইল গুঁতাগুতিতে বেশি করে মনোযোগ দেয় যেন। ওর মধ্যেই পিয়ার মোহাম্মদ ওকে জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা, শাখাগুলোতে কি দালালের উপদ্রব আগের মতোই আছে, নাকি কমছে টমছে?” ছেলেটি গুঁতাগুতি করতে করতে নির্বিকার কণ্ঠে শুধু বলল, “দালাল কী?”

পিয়ার বুঝলো, একে দিয়ে হবে না, নাবালক।

হঠাৎ ‘হাবুল’ কাশেম আবির্ভূত হলো। বুদ্ধির জগতের বিত্তবানগণ বিত্তহীনদেরকে বরাবরই নাড়তে ভালোবাসে। তাদের বদান্যতায় চলনবিলের নিভৃত গ্রাম থেকে উঠে আসা সহজ-সরল আবুল কাশেম প্রাং হয়ে গেল ‘হাবুল’ কাশেম। তার ‘হাবুলত্বের’ সুযোগ অনেকেই নিয়েছে। পিয়ার মোহাম্মদও নিয়েছে। ছাইকোলা শাখা থেকে হাঁসমারি শাখায় বদলির একটা তদবির করে দিয়েছিল। সে অবশ্য কোনো ‘ডিমান্ড’ করেনি। খুব নির্দোষ একটা প্রশ্ন করেছিল শুধু, “তোমাদের চলনবিলের দিকে দো সনা বড় কৈ মাছ কি আগের মতো পাওয়া টাওয়া যায়?” তাতেই কাম হয়েছিল।

দূর থেকে পিয়ারকে দেখে ছুটে এলো কাশেম। স্যার স্যার করে এমন জাউ হয়ে গেল! পারে তো পা ছুঁয়ে সালাম করে। কাশেম জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকে প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হিসেবে বছরখানেক আগে অবসরে গেছে। তার কাছে জানা গেল, শাখাগুলোতে দালাল সম্প্রদায়ের উপদ্রব সেসব দিনের তুলনায় এখন অনেক কম।

কাশেম খানাপিনার সন্ধানে গেল। আগের ব্যাচের অসমাপিকা ভক্ষণক্রিয়া সমাপণরত ব্যক্তির চেয়ারের পিছনে শক্ত লাইন দিতে হবে। আহারান্তে আসন ছাড়িবামাত্র পড়িমরি করে যাবতীয় উচ্ছিষ্ট হাড্ডিগুড্ডি সামনে নিয়ে বসে পড়ে সেটা দখলে নিতে হবে। ওদিকে মিসেস পিয়ারও ভাবীমহলে শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত। একটু নিমগ্ন হবার সুযোগ মেলে পিয়ারের।

শাখা সম্পর্কে ব্রিফ করতে গিয়ে আরএম সাহেব বললেন, “নেও, চা খাও।” হাতের নীল ডায়ালের সিইকো ফাইভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার বাস এগারোটায়, অফিসের সামনে দিয়েই অবশ্য যাবে। ... মনে রাখবা, ওই শাখায় কিন্তু দালালের উপদ্রব আছে... মানে, বেশ ক'জন আছে আর কি। প্রেজেন্ট ম্যানেজার ওদের সাথে ভাগে-যোগে কাম করছে। তুমি নতুন মানুষ, ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বেরিয়েছো, ফ্রেশ ব্রেন, ফ্রেশ মাইন্ড তোমাদের ওপরে ব্যাংকের ভবিষ্যৎ জয়েন করে আগে ক'দিন অবজার্ভ কর, ঐ শালার ব্যাটা ম্যানেজারটাকে রিলিজ করে দাও। তারপর উইকেটে সেট হয়ে চার-ছয় মেরে প্রথমেই দালালগুলোকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠায়ে দিবা।” আরএম সাহেবের কথাগুলোই বারবার মনে পড়ছিল।

দালাল খেদায়নের চ্যালেঞ্জের কথা ভেবে মনটা দমে যাচ্ছিল। নতুন চাকরি, বয়স আট মাস। আট মাস প্রবেশন কাটিয়ে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে শাখায় যাচ্ছে পিয়ার মোহাম্মদ। বুক ভরা উদ্দীপনা, তবে, মনে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা, শংকা।

জেলা সদর থেকে আন্ধারমণি শাখার দূরত্ব আঠাশ মাইল। আশি দশকের সে সময়টায় নির্বিচারে নতুন শাখা খোলা চলছেড় ব্যাংকিং সেবার কলেবর বাড়ছে। এক-দু'খানা চায়ের দোকান, একখানা স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, মেটে রাস্তা বা বড় জোর হেরিং-বোন-বন্ড, মানে দাঁতাল ধরনের ইট বিছানো পথ থাকলেই হলো। আর সেখানে পৌঁছানোর জন্য বাঁকাচোরা মুড়ির টিনের মতো মোটরগাড়ি এক-দু'খানা থাকলে তো কথাই নেই। সে সব জায়গায় হুরমুড়িয়ে শাখা খোলা হচ্ছে।

আঠাশ মাইলের কুড়িমাইল পাকা, বাকি আট মাইল এখনও পাকেনি, ফকফকা ট্যালকাম পাউডারের মতো জমাট সাদা ধুলা। যে বাইশ মাইল পাকা, সেটা যে ঠিক কবে পেকেছিল, সিএস খতিয়ান না দেখে বলা সম্ভব না। এই পথে সকাল-সন্ধ্যা দু'খানা মাত্র বাস চলে। 'বাস চলে' বললে ভুল হবে- বাসের মোটেই ইচ্ছে নেই অসংখ্য খানাখন্দে ভরা এই বিতিকিচ্ছিরি পথে চলার, চালানো হয়। হ্যাক্কত হ্যাক্কত করে বাস চলছে। আর যাই থাক, এমন বিপথগামী পথের শেষে কোনো সুসংবাদ যে নেই, তা নিশ্চিত।

পাশের যাত্রী বাসের কাঠের জানালা দ্রুত নামাতে নামাতে খানিক বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "চোরখোর এসে গেছি।" চোরখোর কি এবং তা এসে যাওয়াতে কার কী এসে গেল, বুঝতে বেশি দেরি হলো না। জানা গেল, চোরখোর একটি বাজার মতন জায়গার নাম, এটা কাঁচা-পাকার সংগমস্থল। এক পশলা হঠাৎ ধুলোয় বাসের ভেতরটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। খটাখট শব্দে সবগুলো জানালা-দরজা বন্ধ হতে হতেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। ধুলো ভেদ করে সামনে তাকালো পিয়ার, উইন্ডশিল্ডের ওপারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোনো ওয়াইপারও নাই। তবুও বাসটা গোঙাতে গোঙাতে কাতরাতে কাতরাতে ধীরে ধীরে হেলে দুলে এগিয়ে চলে।

খৈলগাড়ি পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। শাখাভবন তখনও জনারণ্য। পিয়ার বিস্মিত হয়। মানুষ গিজগিজ করছে। মহা হট্টগোল। পিয়ার ঠেলেঠুলে কোনোক্রমে একটা টেবিলের সামনে পৌঁছাতে পারে। জনাকুড়ি লোক টেবিল ঘিরে সামনে ঝুঁকে শুধু বকে চলেছে, কেউ সেসব শুনছে না। টেবিলের ওপারে একগাদা কাগজের আড়ালে ঘাড় গুঁজে কী সব লিখছে একজন। সুপারভাইজার হবে। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে লোকজনকে হৈচৈ করতে বারণ করছে। পিয়ার দাঁড়িয়ে শুধু বলতে পারে, "এক্সকিউজ মি, ম্যানেজার সাহেবের চেম্বারটা কোন দিকে?" সুপারভাইজার ভুরু কুঁচকে তাকায়। সকলের সমবেত দৃষ্টির সামনে পিয়ারের কেমন বিব্রত ঠেকে। বাসযাত্রার ধকলে পিয়ার মোহাম্মদের পাউডারি মিলডিউ আক্রান্ত শসার পাতার মতো কোঁচকানো মুখাবয়ব থেকে আন্ধারমণি শাখার নতুন ম্যানেজারকে কেউ আবিষ্কার করতে পারে না। তারা তাকে আন্ধারতম কোনো গাঁয়ের ঋণের উমেদার ধরে নেয়।

সুপারভাইজার হাত দিয়ে যেদিকে দেখায়, সেদিকে হাঁটতে গিয়ে চেম্বারের কোনো দিশ পায় না পিয়ার। ভবনের শেষ মাথায় একটা গাছতলায় কজন মানুষ দেখে সেদিকে এগিয়ে যায় এবার। মাংস রান্না হচ্ছে মনে হলো। একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, "এখানে কী হচ্ছে ভাই?" লোকটা বলে, "ওই, আমাদের মেনাজার সাহেবের বদলি উপলক্ষে এলাকার লোকজন গরুর গোশ আর খিচুড়ির আয়োজন করেছে আর কি, হে হে!" এবার সে পাল্টা জানতে চায়, "আপনি কোত্থেকে আসছেন?" পিয়ার মোহাম্মদ জানায়, সে ম্যানেজার সাহেবের কাছে এসেছে। লোকটি হাঁ হাঁ করে ওঠে, "আজকে মেনাজার সাহেবের ধারে কাছে যাওয়ার সুযোগ নাই। আড়াই শ'খান লোন কেস মঞ্জুর করতে হচ্ছে। কম করে পঞ্চাশজন লোক তার রুমে। কখন নতুন মেনাজার চলে আসে, তা তো বলা যায় না। নতুন মেনাজার আসার আগে কামকাজ শেষ করতে না পারলে খবর আছে। তারচে' চলেন আপনাকে ফাইন একটা জাগায় বসায় দেই। আরাম করেন, সুযোগমতো মেনাজারের সাথে দেখা করবেন। আসেন আসেন।"

পিয়ার লোকটার পিছু পিছু যায়। সে পিয়ারকে একটা রুমে নিয়ে বসতে দেয়। সেখানে হাড়িকুরি, প্লেট গ্লাস জগ রাখা। লোকটার নাম জহরদি গায়েন। সে লোকজনকে ঋণ পেতে সাহায্য করে। তারা চারজন আছে। চাঁদাপাতি তুলে এই মচ্ছবের আয়োজন করেছে। পিয়ার মোহাম্মদ বসেই থাকে, বসেই থাকে। পিয়ারের খুব খিদে পেয়েছে, মাংসের গন্ধ খিদেটাকে বেশ উস্কে দেয়। অনেকক্ষণ পর কিছু ব্যস্তসমস্ত লোক এসে শব্দ করে থালা ঘঁটিবাটি টানাটানি করে। খাদ্য বণ্টন হবে। জহরদি গায়েন প্লেটভরা খিচুড়ির উপরে অনেকগুলো মাংস নিয়ে আসে। সাথে লেবু-শসা। খাবার সামনে দিয়েই দ্রুত বেরিয়ে যায় সে। একটু পরেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে সংগে নিয়ে ফিরে আসে।

ভদ্রলোক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চান, "আপনি কি পিয়ার মোহাম্মদ সাহেব?"

"জ্বি।

আপনি নিশ্চয়ই ম্যানেজার, কুতুবুল আলম সাহেব?"

ম্যানেজার সাহেব বেশ সমাদর করে পিয়ারকে তাঁর চেম্বারে নিয়ে গেলেন। খানাপিনা শেষে কিঞ্চিৎ বাতচিত হলো। শাখার অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য পেল পিয়ার মোহাম্মদ। জহরদি গায়েন ম্যানেজারের কানে কানে কী যেন বলে রুমের বাইরে ডেকে নেয়। পিয়ার মোহাম্মদ আবারও একাকী বসে থাকে, ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটায়।

পাশের রুমে কী একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। ঘণ্টাখানেক পর জহরদি গায়েন আসে, বলে, "স্যার, আপনেই বুলে নতুন মেনাজার? লেন, পান লেন।" বলতে বলতে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিয়ারের ডান হাতে একটা পান আর সেই সাথে অনেকগুলো টাকা গুঁজে দেয় জহরদি। বলে, "আপনের ভাগ, আজকেরডা। অসুবিধা নাই, নেয্য অংশই পাবেন এখন থেকে।"

এও কি সম্ভব? পিয়ার মোহাম্মদ কিছুতেই ভেবে পায় না। বিস্ময়, ক্রোধ, হতাশার সম্মিলিত চাপে চোখ বুঁজে স্থাণু হয়ে থাকে। বন্ধ চোখে সুগভীর অন্ধকারে সে একটি পশুর অস্পষ্ট মুখাবয়ব দেখে, দেখতে হায়েনার মতো।

"এই খৈলগাড়ি, খৈলগাড়ি, লাস্ট স্টপেজ। নামেন, সবাই নেমে যান, লাস্ট স্টপেজ।" কন্ডাকটরের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে। একটা ঝাঁকি মেরে গররররর করে থেমে যায় বাস। আড়মোড়া ভেঙে সবার সাথে সাথে ক্লান্ত পায়ে নেমে পড়ে পিয়ার মোহাম্মদ।

ডক্টর কাজী প্রিয়াংকা সিলমী
জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানী
ওয়াহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ
পিতা: ডক্টর কাজী মো. ইমদাদুল হক

হাসপাতালের শুভ্র আলোর মাঝেও সাথীর সবকিছু ধূসর লাগছে। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়ে সাথীর মনে দুঃখ, ভয় ও দুশ্চিন্তা ছাড়াও যে অনুভূতিটা কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে তা হলো অপরাধবোধ। সকালে যদি ছোট্ট ব্যাপারে ছেলের সাথে কথা কাটাকাটি না হতো, তাহলে হয়ত সে রেগেমেগে বাসা থেকে বের হতো না। না বের হলে সে বন্ধুর গাড়িতে থাকত না। আর সেই গাড়িতে না চড়লে এখন হাসপাতালের বিবর্ণ বিছানায় আদরের সন্তানের পরাহত দেহটাকে আশ্রয় নিতে হতো না।

ডাক্তার বলেছেন পায়ের আঘাতটা গুরুতর হলেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু মায়ের মন তো তা মানে না। অবকাশশূন্য ওয়েটিং রুমে বসে সাথীর মনে হাজারো চিন্তা ডেঁয়ো পিঁপড়ার ঝাঁকের মতো দংশন করে – ছেলেকে যেভাবে বড় করতে চেয়েছিল তা কি পেরেছে?

ছেলে তার ভদ্র, পরিশ্রমী ও মেধাবী – সবাই এক কথায় বলবে কাব্য ছেলে ভালো। তাও ছেলের সাথে সাথীর রোজই তর্ক-বিতর্ক লেগে থাকে। কারণ ছেলে কিছুতেই বাংলায় কথা বলতে চায় না। সাথীর পীড়াপীড়িতে কাব্য যেন আরও বেশি একরোখা হয়ে গিয়েছে। বাবার সাথে তাও বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে কথা বলে, কিন্তু ইচ্ছে করেই যেন মায়ের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে ভাষা-শাসনের প্রতিবাদ জানায়।

কাব্যের বাবা অনেক বুঝিয়েছে সাথীকে – এটা মেনে নিতে হবে যে ছেলে আমেরিকান, সেটাই তার আইডেন্টিটি। কাব্য ভাত-মাছের চেয়ে পিজ্জা খেতেই বেশি ভালোবাসে, বাংলা নববর্ষের চেয়ে নিউ ইয়ার পার্টিই তার ভালো লাগে, ঈদের চেয়ে থ্যাংক্সগিভিংকেই প্রাণের উৎসব মনে করে, হয়তো ভবিষ্যতে অবাঙালি মেয়েকে বিয়ে করবে। বাংলার চেয়ে ইংরেজি বলতেই সে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

সবকিছু বুঝলেও, ছেলে তার সাথে বাংলায় কথা বলবে না এতে সাথীর মন মানে না। শৈশব থেকে এত কষ্ট করে বাংলা শেখানো কি সব বৃথা? গল্প শুনতে কি ভালোবাসত কাব্য – বানান করে পড়তে শেখার আগে কতবার টোনাটুনি, লালকমল-নীলকমলের গল্প পড়ে শুনিয়েছে সাথী। সপ্তাহান্তের সাধের ঘুম বিসর্জন দিয়ে প্রতি রবিবার সকালে বাংলা স্কুলে নিয়ে যেত। কাব্য ছোটবেলায় কী সুন্দর করে সুকুমার রায়ের কবিতা বলতো, রবীন্দ্রসংগীত গাইত কী পরিষ্কার বাংলায়, লাল-সবুজ পতাকা এঁকে কী চমৎকার করে নিজের ঘরটা সাজিয়েছিল। কবে যে সেই ছোট্ট বাঙালি আদুরে সোনামণিটা এভাবে অবাধ্য আমেরিকান কিশোর হয়ে গেল, সাথীর মনে পড়ে না।

নার্সকে ওটি থেকে বের হতে দেখে সাথী এগিয়ে যায়। জানতে পারে যে, কাচের টুকরোটা অস্ত্রোপচার করে সফলভাবে বের করা হয়েছে, তবে সিডেটিভের কারণে কাব্য এখনও অচেতন, স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে। ছাইরঙা দেয়ালগুলো যেন রং পালটে ঝকঝকে হলো। রুগীর মাকে আশ্বস্ত করে নার্স চলে যাচ্ছিলেন, কী ভেবে ফেরত এসে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার ছেলে অর্ধচেতন অবস্থায় বারবার বলছিল, "মা, পানি"। তুমি কি জানো ও কী বলছিল?'

এত দুশ্চিন্তার মাঝেও সাথীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে এক বিন্দু আনন্দ অশ্রু। ছেলে তার মুখে যাই বলুক, অবচেতনে সে মায়ের ভাষাতেই কথা বলে।

ঝরে পড়া একটি ফুল

তাসনিয়া রাইসা মুন
এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৫
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়
জয়দেবপুর, গাজীপুর
পিতা: কৃষিবিদ ড. মো. কফিল উদ্দিন

ফুল। পুরো নাম ফুলটুসি। বয়স হবে সাত অথবা আট বছর। ফুলটুসি নাম হলেও সবার কাছে মেয়েটি ফুল নামেই পরিচিত। ফুলদের গ্রামের নাম সুধাপুর। গ্রামের সবাই তাকে অত্যন্ত চঞ্চল, মিষ্টি দুরন্ত মেয়ে হিসেবে চেনে। সারাদিন গ্রামের এ বাড়ি থেকেও বাড়ি ঘুরতে থাকে ফুল। ফুলের অনেক বন্ধুও রয়েছে গ্রামে। ফুলের সমবয়সী কয়েকজন বন্ধু হলো গোপাল, শিলা, তুলি ও রাজু। সারাদিন ওরা কয়েকজন মিলে মাঠে গোল্লাছুট, লুকোচরি খেলে। একসাথে পাশের গ্রামের একটি পাঠশালায় যায় তারা। এবার আসি ফুলের বা-মার কথায়। ফুলের বাবা একজন মুদির দোকানকার। সারাদিন দোকানেই কেটে যায় তার। আর ফুলের মা বাসায় গৃহস্থালির সব কাজকর্ম করেন। ফুলদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো না তবুও তাদের সুখের কোনো অভাব নেই। একদিন ফুল আর ফুলের মা ঘাটে গেল পানি আনতে। সেখানে গিয়ে ফুলের একজন দাদার সাথে দেখা হলো। ফুল বলল, "আসালামু আলাইকুম দাদা। কোথায় যাচ্ছেন?" দাদা বললেন, "ফুল মারে আমি একটু বাজারে যাচ্ছি, বুঝলি?" তখন ফুলের মা কথা বলল। ফুলের মা বলল, "একি চাচা, আপনি এত তাড়াহুড়া করে বাজারের দিকে যাইতাছেন কেন? চাচা বললেন, "একি মা! তুমি দেহি কিছুই জানো না" মা বললেন "কেন চাচা, কী হইছে? ফুলের বাবাও তো আমারে কিছু কয়নি?

চাচা বললেন, "আমাগো গ্রামে ঢাকা থাইকা কিছু মিলিটারিরা আইছে ক্যাম্প করবো বইলা। দেশের অবস্থাতো ভালো না মা। এই যে তিন দিন আগে ঢাকা শহরে অনেকগুলো মানুষরে পাখির মতো গুলি কইরা মারছে ওরা। তা এই খবরটা নেওয়ার জন্যই আমি বাজারে যাইতেছিলাম শফিকের দোকানে রেডিও আছে। সেহানে একটু খবর শুনমু।" মা বললেন, একি সর্বনাশ! আল্লাহ মাফ করুক। মিলিটারিরা গ্রামে আইলে আমাগো কী হইবো তহন, চাচা?" চাচা বললেন, "তহনত আর কী হইবো? আল্লাহ কপালে রাখলে মিলিটারির হাতেই মরা লাগবো।" এই বলে ফুলের ঐ দাদাটি চলে গেলেন। ছোট্ট ফুল মাকে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা মা? মিলিমাটি কে?" মা হাসতে হাসতে বললেন, "মিলিমাটি নারে, মিলিটারি, মিলিটারি। তারা খুব খারাপ বুঝলি? আমাগো দেশের যারেই দেখতে পায়, তারেই মাইরা ফেলে।" ফুল বিস্ময়সূচক ভাবে বলল, "তারেই মাইরা ফেলে?" মা বললেন, "হরে হ তারেই মাইরা ফেলে। এবার হইছে চল বাড়ি যাই "বাড়িতে গিয়েই ফুল আবার রাজুর বাড়িতে গেল এবং রাজুকে ডাক দিলো। তারপর শিলা, তুলি আর গোপালকেও ডাক দিলো। তারপর সবাই জামতলায় বসে তাদের সবার খেলনা দিয়ে খেলা শুরু করল। রাজু একটা খেলনা পিস্তল দেখিয়ে সবাইকে বলল "জানিস, তোরা এইটা আমার আব্বা কাইল ঢাকা থাইকা আনছে। এইটা দিয়া নাকি ঢাকায় মিলিটারিরা মানুষ মারে।"

ফুল বলল, "হ হ মিলিমাটিরা মানুষ মারে। ফুলের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। গোপাল বলল "কিরে ফুল, তোর আর উচ্চারণ ঠিক হইল না! আপা তোরে এতই শিখায়। এটা মিলিটারি হইবো।" ফুল বলল, "হইলেই হয় একটা। তোরা কি শুনছস মিলিটারি আমাগো গ্রামে আইছে?" 'রাজু বললো, "হ আমি শুনছি। দ্যাখ আমি এইটা দিয়া মিলিটারিদের মারমু।" তাই বলে রাজু তার ঐ খেলনা পিস্তল দিয়ে গুলি করার মতো ইশারা করে খেলতে লাগলো। সবাই রাজুর কথায় হেসে উঠলেও ফুল হাসল না। ফুলের রাজুর কথাটি পছন্দ হলো। রাতের বেলা ফুলের বাবা ফুলের জন্য কিছু একটা নিয়ে এলো। ফুল বলল, "বাবা কী আনছ তুমি আমার জন্য?" বাবা বললেন, "মারে, তুই কয়দিন ধইরা খেলনা চাইতেছিলি। তাই তোর জন্য এই খেলনা পিস্তলটা আনছি, আয় দ্যাখতো তোর ভাল্লাগে কিনা?" ফুল খেলনাটা নিয়ে বলল, "হ বাবা অনেক ভালো লাগছে। রাজুরও এইটা আছে। আসলে রাজুর খেলনাটি দেখে ফুলের অনেক পছন্দ হয়েছিল। বাবা একমাত্র মেয়েকে খুশিতে কোলে তুলে নিলেন। পরদিন সকালে ফুল খেলতে যাওয়ার আগে মা বললেন, "ফুলরে, দূরে কোথাও যাসনে মা। গ্রামে তো মিলিটারি আইছে শুনলাম। আজানের আগেই চইলা আইবি। ফুল বলল "আচ্ছা মা আমি এহন যাই" ফুল বন্ধুদের সবাইকে তার নতুন খেলনা দেখাল এবং ফুল বলল, "দ্যাখ রাজু, এইটা দিয়া আমিও মিলিটারিরে মারমু" গোপাল বলল, "চল ঐ ঘাটের শ্যাষে মিলিটারিরা ক্যাম্প বানাইছে ওখানে গিয়া দেখি" সবাই গোপালের কথায় রাজি হলো এবং ঘাটের শেষ মাথায় গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মিলিটারিদের দেখতে লাগল। তারা দেখলো অনেকগুলো মিলিটারি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ফুল বললো দ্যাখ রাজু এইটা দিয়া (খেলনা পিস্তল) আজ ওদের মারমু" রাজু জোরে চিৎকার করে বললো "হ, হ, মারমু !!!" তখন মিলিটারির প্রধান ওদের দেখে ফেলল। ওরা সবাই দৌড়ে পালাতে লাগলো। কিন্তু ফুল দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এমন সময় একজন পাকিস্তানি সৈন্য তাকে পিছন থেকে ধরে ফেলল। ওরা ফুলকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং বলল, "কেন এসেছিস তুই এখানে?" ফুল কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমরা তোমাগো মারতে আইসিলাম এইটা দিয়া" এইটা দিয়া?" তাই বলে সব মিলিটারিরা অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়ল। ফুল আবার বলল, "হ এইটা দিয়া।" তারপর একজন বলল, "এইটা দিয়াই আজ তোমারে মারমু আমরা" এ বলে গুলি চালিয়ে ছোট্ট ফুলের বুক ফুটো করে দিলো। ফুল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এদিকে গ্রামের সবাই খবর পেয়ে ফুলকে বাঁচানোর জন্য ছুটে ফুলের বাবা, মা, চাচা, চাচি, তুলি, রাজু, গোপাল সবাই এলো। ফুলকে তারা ঘাটের পাশেই খুঁজে পেলো। তবে জীবিত নয় এরপর অনেকদিন কেটে গেল। ফুলের মা কোনো কথা বলতে পার না শুধু একটা শব্দ বলতে পারে সেটা হলো "ফুল"।

রাফি তোমাদের ভুলবো না

নাফিসা তাবাসসুম মীম
এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৫
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
উচ্চ বিদ্যালয়, জয়দেবপুর, গাজীপুর
পিতা: কৃষিবিদ ড. মো. কফিল উদ্দিন

তোমরা জেনে থাকবে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের স্কুলে প্রভাতফেরি হয়ে থাকে। আমরা আমাদের ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই। তাই তোমাদের কালকে সকাল ৬.৩০ মিনিটে বিদ্যালয়ে আসতে হবে। এই বলে বোর্ডে লিখা শুরু করলেন চতুর্থ শ্রেণী শিক্ষিকা রুপা মিস। আবার বোর্ড থেকে ফিরে তাকিয়ে বললেন তোমরা সবাই আসবে তো কালকে? সবাই প্রায় চিৎকার করে বলল, জী মিস। শুধু একজন না বোধক উত্তর দিল। আর সে হল এই ক্লাসের সবচেয়ে অমনোযোগী ছাত্র রাফি। মিস রুপা বললেন, কেন রাফি, তুমি কি আমাদের ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নও? তারা সে দিন প্রাণ দিয়েছিল বলেই তো তুমি, আমি, সবাই আজ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি। তবে তুমি কেন কালকে আসতে চাও না? রাফি বলল, মিস, আমরা তাদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা করলে তো তারা আর দেখতে পাবে না। কারণ তারা সবাই মারা গিয়েছে। তাই আমি ভোরবেলায় স্কুলে এসে এসব গান গাওয়া, র‍্যালি এগুলোতে অংশ নিতে পারবো না। ঠিক তখনই ঘন্টা বেজে উঠল মিস রুপা তাই কোনো কথা বলতে না পেরে চলে গেছেন। বাসায় গিয়ে রাফি তার নিত্যদিনের রুটিন অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করল। হঠাৎ রাফি শুনতে পেল তার পরিবারের সকলে কোনো একটি বিষয়ে আলোচনা করছে। তারা বলছেন যে, কাল সকালে তারা সকলে ভাষা আন্দোলনে অংশ নিবেন। রাফি কথাটি শুনে তার নিজের রুমে চলে গেল। পরের দিন রাফির পরিবারের সবাই যখন ভাষা আন্দোলনে অংশ নিতে বেরিয়ে গেলে, রাফিও কৌতুহল বশত তাদের পিছু নিল। সবাই আন্দোলন করছে। রাফিও কম নয়। কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন হঠাৎ পুলিশ গুলি করতে লাগলো। একে একে সবাই গুলিতে মারা যাচ্ছে। রাফির বাবা মার বুকে গুলি লাগলো। তার চাচা-চাচি, খালা খালু সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাদের শরীরের রক্ত দিয়ে রাফির জামা লাল হয়ে গেল। রাফি ভায়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে তো যাচ্ছে। একপর্যায়ে রাফি দেখল, সে একা। আশাপাশে কেউ নেই। সবাই মারা গিয়েছে। সে রাস্তায় বসে কান্না করতে লাগলো। হঠাৎ করে কুকুরের ডাকে রাফির ঘুমভাংলো। সে এক প্রকার চমকে উঠল এবং দেখল যে সে বিছনায়,স্কুল থেকে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাফি। অর্থাৎ রাফি এতক্ষন স্বপ্ন দেখছিল। তারপর তার ভুল ধারনা ভেংগে গেল। সে এখন ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহিদদের তাৎপর্য বুঝতে পেরছে। পরেরদিন সকালে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী রাফি কিছু তাজা গোলাপ নিয়ে স্কুলে গেল। সে প্রভাতে ফেরিতে অংশ নিল। রুপা মিস রাফিকেব দেখে অনেক কিছু খুশি হলেন। রাফি বলল। মিস আমি ভাষা শহিদদের এখন অনেক শ্রদ্ধা করি। এই রাফি ভাষা শহিদদের কখনো ভুলবে না। এই কথাটি বলে রাফি খালি পায়ে গোলাপ হাতে নিয়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে গেল।

শান্তির খোঁজে ওরা

নূরুন্নাহার বেগম
শিশু সাহিত্যিক

শীত জেঁকে বসেছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা সূর্যের সোনা রং। ধোঁয়াশা আলোয় চারপাশের সবকিছুই দৃষ্টিগোচরের বাইরে। সবুজ দূর্বাঘাসের বুকজুড়ে শিশির কণা। টোকা লাগলেই ঝরে পড়বে আর বুক ভেজাবে শীতল মাটির। শরীরে কাঁটা তোলা হিমশীতল বাতাস। বীথিকা প্রতিদিনের মতো ভোরবেলায় উঠে গায়ে শীতের কাপড় জড়িয়ে নিজের পড়ার টেবিলে রুটিনমাফিক পড়া তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ও কি খেতে পছন্দ করে মা আয়েশা জানেন। সময় হলেই মা নাস্তা বানিয়ে টেবিলে দিয়ে যাবেন। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আয়েশা বেগমের তিনটি সন্তানের মধ্যে বীথিকা বড়। পড়াশোনায় মনোযোগী সে। বাড়িঘর গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখে। ছোট দুটি ভাই-বোনকে আদর করে, আগলে রাখে। ওর চঞ্চলতা, চপলতায় বাড়ির সবাই অস্থির। বাড়িতে আপনজন কেউ বেড়াতে এলে ওকেই যেন আগবাড়িয়ে যেয়ে তাদের আদর আপ্যায়নে অংশ নিতে হবে।

ক'দিন ধরে বীথিকার হাবভাব ভালো না। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে সে। সবে এগারো বছরে পা দিয়েছে। ফর্সা লম্বা সুন্দর চেহারার মেয়েটি বাড়িসুদ্ধ সবার চোখের মণি। বাড়িময় ওর ছুটাছুটি, কণ্ঠে গানের কলি, ছড়ার দু'চার লাইন ঘরময় ছন্দের তোলপাড় যেন। উঠোনে পাতা দোলনা ওর ভীষণ পছন্দ। বাতাস কেটে কেটে বীথিকা প্রাণভরে আনন্দ নেয় দোদুল দোলনায়।

ওর মন খারাপের কারণ অন্বেষণে আয়েশা বেগম তার ছোট ভাই নজুকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নজুমামা বীথিকার ছোট মামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। মামার কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গল্প শোনে সে। প্রায়ই ওর মামাকে বলে, 'মামা, আমিও তোমার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব।' মামাও সেই সাথে বলে, 'তোকে তো তাহলে ভালো রেজাল্ট করতে হবে।'

বীথিকা প্রাইমারিতে বৃত্তি পেয়ে সবে সেকেন্ডারিতে উঠেছে। ওর গৌরবোজ্জ্বল ফলাফলে নজুমামা ভীষণ খুশি। তাই সে উপহার হিসেবে দিয়েছে অনেকগুলো বই। সময় করে এসব বই পড়তে বলেছে। বীথিকার মনে আনন্দ ঢেউ খেলে যায়। অথচ প্রজাপতির মতো চঞ্চল, হৈ-হুল্লোড় করা মেয়েটার হঠাৎ করে কী হলো যে সে চুপচাপ হয়ে গেল। বাবা কাশেম কৃষক মানুষ। লেখাপড়ার এতসব বোঝেন না। মেয়ের জন্য বাবার মনেও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠতে বীথিকার বাবা মামার শরণাপন্ন হয়েছেন।

সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। নজুমামা বীথিকাকে নিয়ে বসেন বাড়ির সম্মুখে পুকুর পাড়ে। বীথিকা খানিকপরে বলছে মামা, এখানে ভালো লাগছে না - ঠান্ডা লাগছে। বাড়ির ভিতরে চলো। তাহলে চল তোর রুমের বারান্দায় গিয়ে বসি। তাই চলো।

-মামা তুমি নামাজ পড়?

- হ্যাঁ পড়ি।

- হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলতো? টিভি দেখ? দেখি। খবর শুনি, নাটক দেখি।

- পত্রিকা পড়?

এত প্রশ্ন তো তো আগে কখনো করেনি বীথি।

নজু সব প্রশ্নের উত্তর দিলেও স্বাভাবিকভাবে নিতে পাচ্ছেন না কিছুই। আবার উত্তর দিতে একটু দেরি হলেই সে আবার রেগেও যাচ্ছে। নজু আরো বেশি অবাক হচ্ছে। যে মেয়েটা হাসিখুশি, মিশুক মনের তার আবার এমন অদ্ভুত আচরণ কেন? নজুর কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই। একটু নড়েচড়ে বসে বীথিকাকে আদর করে বলছে, মা বীথি এই ঠান্ডায় এক কাপ গরম গরম চা খেলে ভালো হতো না?

হ্যাঁ মামা ঠিকই বলেছ। এতক্ষনে ওর স্বাভাবিক একটা উত্তরে স্বস্তি পেলো নজু। ওর কাছ থেকে কীভাবে কথা আদায় করা যায়। বীথিকাকে বাইরে কোথাও ঘুরে আসার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়?

- বাইরে যাবি কোথাও?

- চা হাতে মামাকে দিচ্ছে আর বলছে, না মামা এখন আর বাইরে কোথাও যাব না। এখানেই ভালো। তোমার সাথে গল্প করতে ভালো লাগছে মামা। নজুতো মনে মনে এ-ই চাচ্ছিল। বীথিকা স্বাভাবিক হোক। ওর মন খারাপের কারণটা শোনার জন্যই তো এত কসরত।

শোন মামা, 'আমার স্কুলের একবড় আপা ক্লাস সেভেনে পড়ে। বলো কতই আর বয়স হবে তার? ওর বাবা - মা স্থানীয় কিছু মানুষের চাপে ওকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। বলো মামা এটা কি ঠিক হচ্ছে? আরো কি জানো ঐ মেয়েটা ক্লাসে ফার্স্ট। দেশে নাকি আইন আছে ! আইন থাকা সত্ত্বেও মানুষ গায়ের জোরে, অর্থের প্রভাব খাটিয়ে অন্যায়কে ন্যায় করবে এটাতো হতে পারে না মামা।'

নজু অবাক হয়ে শোনে ওর কথা। এই ছোট্ট একটা মেয়ে, এত কথা বলে কি করে?

তুই ছোট মানুষ তোর এত বুঝে লাভ কী? কে কাকে বিয়ে দিচ্ছে দিক, তাদের হয়তো সন্তান বেশি, মেয়েকে পড়িয়ে লাভ কী? নানান কিছু ভেবেই মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

- 'না মামা না, তুমি জানোনা। আপুটার মত নেই। আপুটা নিজে জোরগলায় আপত্তি জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। যদি সেই আপুটার বেলায় তোমার উত্তর এমন হয় তাহলে আমার বেলায় তোমার কেমন উত্তর থাকবে তা আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এমন পরিস্থিতি তো আমার ক্ষেত্রেও হতে পারে। এই বিয়ে যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে মামা।'

ওর বলা থেমে নেই। 'এই গ্রামে আরো এরকম দুয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বিয়ের প্রলোভন দিয়ে একটা মেয়ের সাথে মেলামেশা করছে। এখন আর তাকে বিয়ে করছে না। সে মেয়েটা ফাঁসিতে ঝুলে শেষ হয়েছে। তুমি তো দূরে থাক গ্রামের এতসব ঘটনা তুমি জানো না, মামা।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বীথিকাকে কিছু একটা বলতে চেয়ে আয়েশা বেগমকে দেখে চেপে যায় নজু।

- কী ব্যাপার তোরা মামা - ভাগ্নিতে শুধু গল্প করবি, খাবি না?

- যাচ্ছি আপা।

- তুই এতসব জানলি কী করে?

- 'কেন? জানা কি অপরাধ? আমরা এক স্কুলে, একই গ্রামে বসবাস করি না? লোকমুখে সব কথাই শোনা যায়। এখনতো সবার মুখে মুখে এসব কথা। আগে আমি ছোট ছিলাম এখন একটু একটু করে বড় হচ্ছি না, বলো? তাছাড়া তুমি যে বইগুলো দিয়েছ ওগুলো পড়লেই তো অনেক কিছু জানা যায়। তুমি তো আবার বলো বেশি করে বই পড়তে।'

নজু বুঝতে পেরেছে বীথিকা চুপচাপ থাকার কারণ। ওকে বুঝিয়ে বলে ওকে থামাতে হবে পাশাপাশি যে ঘটনা দুটির কথা ও বলল সেগুলো যাতে করে আর বাড়তে না পারে সেজন্য স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, যুবকদের, অবিভাবকদের সংঘবদ্ধ করে এতসব সামাজিক অবক্ষয় সবাইকে নিয়েই নির্মূল করতে হবে। সামাজিক সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।

মামাকে চুপ থাকতে দেখে বীথিকা আবার ঝেড়ে উঠলো।

দেখ মামা, আমি বেশি কথা বলতে পারব না। তোমার পক্ষ থেকে তুমি এই বিষয়ে যা যা করণীয় সব করবে। আর মাকেও বারণ করবে আমার সাথে যেন কথায় কথায় এত গালমন্দ না করে। আর সময়ে সময়ে বলবে এদিক যাবি না ওদিক না। এত না, না শুনতে আমার ভালো লাগে না।

মা তো একটু আধটু বকা দিতেই পারে। তোর মাকেও তার মা বকেছে। মায়েরা সন্তানের ভালো চায় জন্যই তো বকে। সমাজের যে অবক্ষয়, প্রত্যেক অবিভাবকদের উচিত নিজেদের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা।

- আপা শোনো তোমাকেই বলছি। আয়েশা বেগম বললেন বলতে থাক, আমি শুনছি। দুলাভাইকেও ডাক।

যদিও বীথিকা থামার মেয়ে না। তারপরেও মামার সাথে বকবক করে অনেকক্ষণ পর বীথিকার মন আজ অনেকটা সজীবতা পেলো। সেই আগের মতো প্রজাপতি হয়ে হালকা পায়ে ওর রেশম চুলে রাত্রির বাতাস দুলিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকে। পিছনে আয়েশা, নজু, কাশেম মেয়েকে স্বাভাবিক হতে দেখে আনন্দে আটখানা। ছোট ভাই - বোন দুটি বিছানায় বালিশ নিয়ে ছোড়াছুড়ি করতে করতে একসময় থেমে গিয়ে আপুকে শান্ত হতে দেখে যেন খুসিতে বাক-বাকুম।

শিবগঞ্জে বন্ধুত্ব

শিবগঞ্জে..... যেখানে নদী বয়ে যায়
সেখানে সবুজ ক্ষেত আর সোনালি ফসল জন্মায়।
বন্ধুত্ব ফুটে ওঠে ভোরের আলোর মতো
একটি বন্ধন এত উষ্ণ, একটি উজ্জ্বল অনুভূতি।

শিবগঞ্জের বন্ধুরা জড়ো হয়, হাসি ভাগ করে নেয়
গল্প বলে হৃদয় খালি করে।
গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকা মহানগর পর্যন্ত
শিবগঞ্জের বন্ধুরা হাঁটে ঘনিষ্ঠভাবে, পাশাপাশি।

ফসল কাটার দিনে এবং শান্ত রাতের মধ্য দিয়ে
সহজ ও ছোট আনন্দে,
শিবগঞ্জের বন্ধুদের হৃদয়ে সর্বদা সদয় এবং সত্য নিহিত
তারা যা কিছু করে তার মধ্যে বন্ধুত্ব বেঁচে থাকে।

উষ্ণতায়, ভালোবাসায়, যত্নের জায়গায়
শিবগঞ্জের চেতনায় বন্ধুরা আছে।
প্রতিটি ঝড়ের মধ্য দিয়ে, প্রতিটি রৌদ্রোকরোজ্জ্বল দিনে
শিবগঞ্জে..... প্রকৃত বন্ধু সব সময় থাকে।

এ.এইচ.এম রাকিবউল্লাহ (রকিব)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বাংলাদেশ

সত্যের জয়

একটা মিথ্যা ঢাকতে কেন
অনেক মিথ্যা বলো?

মিথ্যা পথ ছেড়ে তুমি
সত্য পথে চলো।
সত্য কথা বলতে যদি
ক্ষতি তোমার হয়,
তবুও চলো সত্যের সাথে
একদিন হবে জয়।

মিথ্যার উপর ভর করে
চলছে আজ যারা,
সত্যের কাছে ধরাশায়ী
হবে একদিন তারা।
মিথ্যা যে অন্ধ জগৎ
চলতে তাই মানা,

সত্য সর্বদায় আলোর পথ
সবার আছে জানা।

মৌমিতা আক্তার নিঝুম
মমতাজুর রহমান আদর্শ কেজি এন্ড হাই স্কুল
দশম শ্রেণি
পিতা: মো. মোফাচ্ছের আলী

সুবাইতা তাসনিম
প্রথম শ্রেণি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
পিতা: কৃষিবিদ মুহাম্মদ তাহাজ্জত আলী

আশা

দিলীপ কুমার সরকার
সহকারী পরিচালক
জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, নওগাঁ

আশা থাকা চাই জগতের প্রতিটি মানুষের ইহলৌকিক জীবনে,
মানুষ বেঁচে থাকে আশায় অনিন্দ্য সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনে।

মানুষের জীবন মূল্যহীন যখন জীবন থেকে আশা হারিয়ে ফেলে,
সামনে এগিয়ে যেতে মানুষ আশায় স্বপ্নের নানা ডালপালা মেলে।

দিন দিন সামনে এগিয়ে যেতে যেতেই একদা সফলতা দেয় ধরা,
কোনো বিষয়ে আশাহীনতায় পার্থিব জীবনে সফলতায় অজেয় তারা।

সফলতায় মানুষ সফল ব্যক্তির কঠোর শ্রমের পেছনের গল্প শোনে,
পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে গেলে আশার মর্ম সবাই জানে।

কাজের কর্মস্পৃহা মানসিকতা তৈরি হয় মানুষের আশার কারণে,
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আশাহীন অলসের সফলতা অসম্ভব ব্যক্তি জীবনে।

সুন্দর মানসিকতা তৈরি হয় মানুষের আশা সম্পর্কিত উক্তি পড়ে,
ভালো কিছু ঘটতে যাচ্ছে এমন অনুভূতিই আশা নামে মনে ধরে।

কোনো সময় বিলাপ সব আশা শেষ,আর কোনো স্বপ্ন নেই জীবনে,
মানব জীবনের অন্তহীন হতাশা কাটিয়ে স্বপ্নের আশা জাগে মনে।

কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের কাছে পৌঁছতে মনের মণিকোঠায় আশা একটুখানি,
কঠিন রোগে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রীর আশায় উজ্জ্বল চোখের মণি।

মানুষের মনে আশা জেগে রয় জীবনকে অকৃত্রিম ভালোবাসে বলে,
পরিশ্রম যত্নে আশা নিয়ে হাসিতে ভরে উঠবে নিশ্চয় স্বপ্ন সফলে।

স্বপ্নকে সত্যি করতে চাইলে মানুষকে হতে হয় যত্নবান স্বপ্ন পূরণে,
নিজ যোগ্যতা সামর্থ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন পারিপার্শ্বিকতার সনে।

গড়পরতা মানুষের উচ্চাশা হতাশার কারণ-আশাভঙ্গের যন্ত্রণা মনে,
যোগ্যতানুযায়ী স্বপ্ন দেখা উত্তম-দৃঢ় মনোবল প্রচেষ্টা শ্রম প্রয়োজনে।

আলহামদুলিল্লাহ

আকাশ হয়েছে ধন্য !
উচ্চতার জন্য,
ঝর্ণা হয়েছে ধন্য !
বিশালতার জন্য,
সাগর হয়েছে ধন্য!
গভীরতার জন্য,
পৃথিবী হয়েছে ধন্য!
মুসলমানের জন্য,
মুসলমান হয়েছে ধন্য!
প্রিয় নবীর জন্য, আমি হয়েছি ধন্য!
তার উম্মত হওয়ার জন্য,
"আলহামদুলিল্লাহ"

মোঃ আবু হুরায়রা ইবনে আবু বকর
আওয়াল জামাত
মাদ্রাসা হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু
পিতা: মো. আবু বকর সিদ্দিক

নাফিসা তাবাসসুম মীম
এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৫
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
উচ্চ বিদ্যালয়, জয়দেবপুর, গাজীপুর
পিতা: কৃষিবিদ ড. মো. কফিল উদ্দিন

Adv. Shafiqul Islam Tuku

M.A, B.Ed, LL.B; M.A.C.C
Senior Advocate, Bogura Judge Court

Member, Bangladesh Bar Council, G.P, Bogura.
Ex President, Vice President & Secretary, Bogura Bar Somity.
Ex Vice President, Shibganj & Adviser Bogura Zila BNP.
Ex Secretary, Bogura Zila Zia Parishad, Organizing Secretary
& Assistant Secretary, Zia Parishad, Central Committee, Bangladesh

Chamber:
Ghahar Ali Bar Bhaban
Bogura, Room No-245
Mobile: 01728-500787

IQBAL'S Dental Clinic

IQBAL'S Dental Clinic

আলহাজ্ব ডাঃ আশিক মাহমুদ ইকবাল (স্বাধীন)

বিডিএস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)
পিজিটি, সিডনি ডেন্টাল হাসপাতাল, অষ্ট্রেলিয়া
ডাব্লিউএইচও রিসার্চ ফেলো
সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্রেলিয়া

প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
বি.এস.এম.এম.ইউ
(পিজি হাসপাতাল)

চিফ কনসালটেন্ট
ইকবালস ডেন্টাল ক্লিনিক
মফিজ পাগলার মোড়, শেরপুর রোড, বগুড়া
মুঠোফোন: ০১৭৩৩৫৭৩৫৩৬
দূরভাষ: ০৫১-৬৪৯২৩ (বাসা)

সালতামামি ২০২৪

ফ্যান্টাসি আইল্যান্ড মিলন মেলা-২০২৪